৪. জাগীরদারি সংকট

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মোগল শাসকশ্রেণিকে শুধু রাজনৈতিক নয়, এক দুরূহ অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। তা হল জাগীরদারি সংকট। মোগল শাসকশ্রেণির সাংগঠনিক কাঠামোটি অনেকটাই নির্ভর করত জাগীরদারি ব্যবস্থার ওপর। ফলে এই ব্যবস্থায় যখন ভাঙন ধরে, তার প্রভাব পড়ে সমগ্র শাসকশ্রেণি তথা সাম্রাজ্যের ওপর। মোগল অভিজাতবর্গের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এর ফলে বৃদ্ধি পায়, শাসক-শ্রেণির অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাগুলি প্রকট হয়ে ওঠে। মোগল সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত হয়।

মোগল শাসকশ্রেণির সংকট শুধু রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিকও

Scanned with CamScanner

মোগল সাম্রাজের পতনে আওরঙ্গজেবের ভ্রান্তনীতির ওপর জোর দেওয়া হত

১৯৬০-৭০-এর দশক থেকে আর্থ-সামাজিক দিকের ওপর গুরুত্ব

ইরফান হাবিব, সতীশ চন্দ্র, নুরুল হাসান, আতহার আলি

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা চলছে। ঐতিহাসিকগণ সাধারণত আওরঙ্গজেবের অনুদার ধর্মীয় নীতি, ভ্রান্ত রাজপুত ও দাক্ষিণাত্য নীতি, পরবর্তী মোগল বাদশাহগণ ও অভিজাতবর্গের অযোগ্যতা প্রভৃতির ওপর জোর দিয়ে এসেছেন। ১৯৬০ ও ৭০-এর দশক থেকে ইরফান হাবিব, সতীশ চন্দ্র, নুরুল হাসানের মতো ঐতিহাসিক পতনের কারণ অন্বেষণে আর্থ-সামাজিক দিকগুলির ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। ইরফান হাবিব বলেছেন, মোগল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী ছিল তার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও এই দ্বন্দ্বের মূলে রয়েছে শ্রেণিসংঘাত। উচ্চতর শ্রেণির ক্রমাগত চাপের ফলে নীচু শ্রেণি বিদ্রোহের পথে যেতে বাধ্য হয়েছিল। সতীশ চন্দ্র, নুরুল হাসান ও পরবর্তীকালে আতহার আলির মতো ঐতিহাসিক এই অবস্থার জন্য প্রধানত জাগীরদারি সংকটকে দায়ী করেছেন।

সামাজিক উদ্বৃত্ত যথেষ্ট নয়

কৃষিজ উৎপাদন হ্রাস, পণ্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি

'জমা' ও 'হাসিলে'র ফারাক

সীমিত সংখ্যক উৎকৃষ্ট জাগীর নিয়ে দ্বন্দ্ব

সতীশ চন্দ্র জাগীরদারি সংকটের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, সংগৃহীত সামাজিক উদ্বৃত্ত প্রশাসনিক ও বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনের এবং শাসকশ্রেণিকে তার প্রত্যাশা অনুযায়ী জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। পশ্চিমদেশের মতো ভারতেও এই সময় মুদ্রার মূল্য হ্রাস পায়। একই সঙ্গে শাসকশ্রেণির জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। অতএব কৃষি উৎপাদন ও কৃষিজ দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পেলেই ভারতীয়দের আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু শাসকশ্রেণির প্রয়োজন যে হারে বৃদ্ধি পায় উৎপাদন সে হারে বাড়েনি। একদিকে কৃষির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছিল, অপরদিকে পণ্যসামগ্রীর মূল্য প্রচুর বৃদ্ধি পায়। এর ফল হল জাগীরের 'জমা' অর্থাৎ নির্ধারিত বা অনুমিত রাজস্বের চেয়ে 'হাসিল' অর্থাৎ আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণের উল্লেখযোগ্য হ্রাস। এই অবস্থায় রাজস্ব পূর্ণমাত্রায় আদায় হয় এমন উৎকৃষ্ট জাগীরের পরিমাণ সীমিত হয়ে পড়ে। একই সঙ্গে নানান রাজনৈতিক কারণে মনসবদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সীমিত সংখ্যক জাগীরের জন্য মনসবদারদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। এটিই হল জাগীরদারি সংকটের স্বরূপ।

শাহজাহানের সময় সংকটের শুরু

মনসবদারদের বেতন প্রদান ও সামরিক দায়দায়িত্ব হ্রাস

জাগীরদারি সংকটের শুরু শাহজাহানের শাসনকাল থেকেই। কোনো মনসবদারকে যে জাগীর দেওয়া হত তার 'জমা' তার প্রাপ্য বেতনের সমান হলেও, সেই জাগীরের 'হাসিল' তার অর্ধেক অথবা কোনো কোনো অঞ্চলে তার এক-চতুর্থাংশ হত। এই সমস্যার সমাধান হিসাবে শাহজাহান মনসবদারদের দশ, আট, ছয় এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে চার মাসের বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। একইসঙ্গে তাদের সামরিক দায়দায়িত্বও হ্রাস করা হয়। এইভাবে সমস্যা কিছুটা আয়ত্তে আনলেও শাহজাহান কোনো স্থায়ী সমাধানের পথ দেখাতে পারেননি।

আওরঙ্গজেবের সময় সংকট জটিল রূপ নেয়

রাজনৈতিক কারণে মনসবদারের সংখ্যা বৃদ্ধি কিন্তু 'পাইবকী' জমি সীমিত

উৎকৃষ্ট জাগীর লাভ করলেও বদলির সম্ভাবনা

আওরঙ্গজেবের শাসনকালে এই সংকট আরও জটিল রূপ নেয়। সাম্রাজ্যের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য তিনি ব্যয় সংকোচের চেষ্টা করেন। তা ছাড়া নতুন কর ধার্য করা হয় ও মনসবদারদের কৃষি সম্প্রসারণের দিকে দৃষ্টি দিতে বলা হয়। এদিকে দাক্ষিণাত্য যুদ্ধের সময় দক্ষিণের অনেক সামরিকনেতাকে মনসব প্রদান করে মোগলপক্ষে গ্রহণ করা হয়। ফলে 'পাইবকী' বা বণ্টনযোগ্য জমির তুলনায় মনসবদারদের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। দাক্ষিণাত্য ও মারাঠা যুদ্ধের ফলে উত্তর ও দক্ষিণ ভারত সর্বত্রই শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়তে শুরু করে। ফলে মনসবদারগণ তাদের জাগীর থেকে মোট জমার ভগ্নাংশ মাত্র আদায় করতে পারত। সব মনসবদারই উৎকৃষ্ট জাগীর দাবি করত। কিন্তু তা লাভ করলেও কিছুদিনের মধ্যে সেখান থেকে বদলি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। নতুন জাগীর পেতেও অনেক সময় প্রচুর বিলম্ব হত। এইভাবে এক জাগীরহীন মনসবদারশ্রেণির সৃষ্টি হয়।

Scanned with CamScanner

দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর ও গোলকোন্ডা রাজ্যদ্বয় অধিকার করে অতিরিক্ত জমির ব্যবস্থা করা যেত বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু সতীশ চন্দ্র দেখিয়েছেন, তাতে সমস্যার সমাধান হত না কারণ দাক্ষিণাত্য ছিল ঘাটতি অঞ্চল।

জাগীরহীন মনসবদার শ্রেণি

জন রিচার্ডস জাগীরদারি সংকটকে আওরঙ্গজেবের ভ্রান্তনীতির ফল বলে মনে করেন। তিনি মনে করেন জাগীরের ঘাটতি বিজাপুর ও গোলকোন্ডায় অধিকৃত জমি দিয়ে পূরণ করা যেত। তা না করে এখানকার সবচেয়ে উর্বর অঞ্চলগুলিকে তিনি খালিসা জমিতে পরিণত করেন। বাকি জমির একাংশ দাক্ষিণাত্যে নিযুক্ত মনসবদারদের জাগীর হিসাবে প্রদান করা হয়। জাগীর হিসাবে বণ্টনের জন্য অবশিষ্ট জমি ছিল অনুর্বর ও অশান্ত অঞ্চলে অবস্থিত যেখান থেকে রাজস্ব আদায় করা কঠিন ছিল। জন রিচার্ডসের মতে জাগীরদারি সংকট ছিল কৃত্রিম। এর কারণ আওরঙ্গজেবের ভ্রান্তনীতি, সম্পদের ঘাটতি নয়। রিচার্ডসের মূল বক্তব্য হল আওরঙ্গজেব বিজাপুর ও গোলকোন্ডার সম্পদ দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে কাজে লাগানোর ব্যাপারে বেশি আগ্রহী ছিলেন। শেখর বন্দোপাধ্যায় দেখিয়েছেন, দাক্ষিণাত্যে দুরূহ মারাঠা সমস্যা সমাধানের জন্য বাদশাহ যে তাঁর সব সম্পদ কাজে লাগাবেন, তা স্বাভাবিক। তবে সামগ্রিকভাবে সাম্রাজ্যের ব্যয়ভারের তুলনায় সম্পদের যে ঘাটতি দেখা দিয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

জন রিচার্ডসের অভিমত

দাক্ষিণাত্যের জমি দিয়ে সংকট মেটানো যেত

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়- ওই জমি মারাঠা সমস্যাসমাধানে লাগানো হয়

জাগীরদারি সংকটের জন্য আওরঙ্গজেবের ভ্রান্তনীতি বা সম্পদের ঘাটতি, যাই দায়ী হোক, সংকট যে ছিল এ নিয়ে দ্বিমত নেই। সংকট চরমে পৌঁছয় ১৭১২ খ্রি.-এ বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর। মোগল সাম্রাজ্যের দীর্ঘদিনের সঞ্চিত সম্পদ এই সময় প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসে। এরজন্য দায়ী ছিল তাঁর দরাজ হাতে জাগীর বণ্টন। জাহান্দর শাহের (১৭১২-১৩ খ্রি.) শাসনকালেও পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকে। ফারুখশিয়ারের সময় (১৭১৩-১৯ খ্রি.) জাগীরের মূল্য বাদশাহের আদেশনামার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তী বাদশাহ মহম্মদ শাহের শাসনকালেও (১৭১৯-৪৮ খ্রি.) পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। মনসবদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু জাগীর জমি বৃদ্ধি না পাওয়ায় খালিসা জমি থেকে মনসবদারদের জাগীর দেওয়া হয়। ফলে বাদশাহের নিজের আয় হ্রাস পায়।

পরবর্তী মোগল বাদশাহদের শাসনকালে সংকট বৃদ্ধি

খালিসা জমি থেকে জাগীরদান

বাদশাহের আয় হ্রাস

মোগল শাসকশ্রেণি ও সাম্রাজ্যের ওপর জাগীরদারি সংকটের প্রভাব গভীরভাবে অনুভূত হয়। প্রাপ্য বেতন না পেয়ে মনসবদারগণ তাদের সওয়ার পদ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক সেনা রক্ষণাবেক্ষণ করত না। এ সমস্যাটি অবশ্য দীর্ঘদিনের। এর প্রতিকারে আকবর প্রতিটি ঘোড়ার 'চেহ্‌রা' ব বিবরণাত্মক তালিকা এবং 'দাঘ' অর্থাৎ চিহ্নিতকরণ প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন। সম্ভবত এতদ্‌সত্ত্বেও জাহাঙ্গীরের শাসনকালে অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। শাহজাহান মনসবদারি ব্যবস্থায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন আনেন। যারা 'হিন্দুস্থানের' কোনো প্রদেশে বা নিজেদের কর্মক্ষেত্রে জাগীর পেতেন, তাদের সওয়ার পদের এক-তৃতীয়াংশ ও যারা হিন্দুস্থানের বাইরে জাগীর পেতেন তাদের এক-চতুর্থাংশ সেনা রক্ষণাবেক্ষণ করতে হত। যারা বল্‌খ, বাদাখশান বা কাবুল অঞ্চলে জাগীর লাভ করত তাদের সওয়ার পদের এক-পঞ্চমাংশ সেনা রাখলেই চলত। একপঞ্চমাংশের নীতি 'নগদী' মনসবদারদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। মনে করা হয় যে আওরঙ্গজেবের শাসনকালে এক তৃতীয়াংশ সেনা রক্ষণাবেক্ষণের নীতিই সাধারণভাবে বলবৎ ছিল। তা সত্ত্বেও জাগীর থেকে মনসবদারদের আয় ভীষণভাবে হ্রাস পায়। ফলে তারা সামরিক কর্তব্যও যথাযথভাবে পালন করত না। দাক্ষিণাত্য যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় আওরঙ্গজেব এ ব্যাপারে মনসবদারদের বাধ্য করতেও পারতেন না। মহম্মদ শাহের ওপর গবেষণায় জাহিরউদ্দিন

জাগীরদারি সংকটের ফলাফল

মনসবদারগণ নির্দিষ্ট সংখ্যক সেনা রাখত না

আকবরের প্রতিকার 'চেহ্‌রা' ও 'দাঘ'

শাহজাহানের সংশোধন

আওরঙ্গজেবের সময় নির্দিষ্ট সংখ্যার ১/৩ সেনা রক্ষণাবেক্ষণের নীতি

মহম্মদ শাহের সময় কয়েকজন পদস্থ আমলা ছাড়া কেউ সেনা রক্ষণাবেক্ষণ করত না

Scanned with CamScanner

মালিক দেখিয়েছেন সেই সময় ওয়াজির, মীর বক্সী ও সামান্য কিছু অভিজাত ছাড়া কোনো মনসবদারই সেনা রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে নজর দিতেন না। এর কারণ ছিল প্রধানত অর্থনৈতিক।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বৃদ্ধি

উৎকৃষ্ট জাগীর লাভের জন্য রেষারেষি

পছন্দমতো জাগীর না পেয়ে মনসবদারগণ বাদশাহের ওপর আস্থা হারায়

পৃষ্ঠপোষক ও পোষ্যবৃন্দের সম্পর্ক ভেঙে পড়ে

জাগীরের অভাব ও উৎকৃষ্ট জাগীরের জন্য রেষারেষির অনিবার্য ফল হল মোগল অভিজাতবর্গের মধ্যে তীব্র গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। মোগল সাম্রাজ্যের বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে তারা ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সব গোষ্ঠীই বাদশাহের ওপর ও রাজসভায় নিজেদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। সকলেই চাইত ওয়াজির ও মীর বক্সীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি নিজ গোষ্ঠীভুক্ত লোকেদের মধ্যে রাখতে যাতে উৎকৃষ্ট জাগীরগুলি নিজেদের মধ্যে বণ্টন করা যায়। জাগীর নির্ভর মনসবদারি ব্যবস্থার ওপর মোগল সাম্রাজ্যের সাংগঠনিক কাঠামোটি নির্ভর করত। ফলে জাগীর থেকে নিজেদের প্রাপ্য আদায় করতে না পেরে মনসবদারগণ বাদশাহের ওপরও আস্থা হারায়। বাদশাহ ও মনসবদার তথা শাসকশ্রেণির মধ্যে পৃষ্ঠপোষক ও পোষ্যবৃন্দের সম্পর্ক বিরাজ করত। ক্রমান্বয়ে সামরিক বিপর্যয় ও তীব্র সম্পদ ঘাটতির ফলে বাদশাহ পোষ্যবৃন্দের আনুগত্য হারান। ফলে পৃষ্ঠপোষকতার সম্পর্কটি ভেঙে পড়লে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলও দুর্বল হয়ে পড়ে।

Scanned with CamScanner